অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই

শামসুর রাহমান

কাব্যগ্রন্থ(১৯৮৫)

অন্য কিছু

আমার তিনটি শার্ট চাই আপাতত, এক জোড়া
ট্রাউজার, দুটি গেঞ্জি আর তিন জোড়া জুতো।
আন্ডারওয়ার অবশ্যই, রবিন পাখির মতো কয়েকটি
রুমালও জরুরি। চাই কিছু গ্রন্থাবলি; চাই, চাই-
বীমার কিস্তির টাকা, চাই মাগ্যিভাতা, রেস্ত রোজ।
শুধু কি এসবই চাই? অন্য কিছু নয়?
খবর কাগজ ওড়ে হাওয়ায়, যেন ওরা
পরীর পোশাক মিহি ঝলমলে, কিঞ্চিৎ রহস্যময় বটে,
বহুরূপী মেঘের নানান স্তরে ভাসমান দেখি।
সেলুনে মুণ্ডিত হতে দেখি রোজ
কিছু মাথা, রকমারি ছাঁট কী বাহারি চুলে
দেখি মঞ্চে বিদূষক নায়কের কানে
কী যেন কী বলতে গিয়ে হেসে লুটোপুটি,
দুটি শালিখের দিকে একজন বুড়োসুড়ো লোক
ছুঁড়ে দেন বাসি রুটি, গলির ধুলোয়
বালক বানায় দুর্গ, জুয়াড়ী পয়সা গোঁজে ট্যাঁকে।
শুধু কি এসবই দেখি? অন্য কিছু নয়?

কখনো গলির মোড়ে অস্পষ্ট সংলাপ শুনি দু'টি
মানুষের, কখনোবা কর্কশ বচসা, চৌরাস্তায়
পুলিশের বাঁশি বাজে, মধ্যরাতে ক্ষিপ্র কুকুরের
পদশব্দ; ফেরি-অলা ডেকে যায় মধ্যবিত্ত কিশোরীকে আর
মহিলাকে সচকিত ক'রে; প্রায়শই গৃহিনীর
অসুস্থ বিলাপ শুনি, রেডিওতে শস্তা গান বাজে
একটানা, অকস্মাৎ মেঘের গর্জন শুনি চৈত্রের আকাশে।
শুধু কি এসবই শুনি? অন্য কিছু নয়?

অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই

কস্মিনকালেও অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই।
না ছোরা, না ভোজালি, না সড়কি না বল্লম
না তলোয়ার না বন্দুক-
কোনা কিছুরই প্রয়োজন নেই আমার।
আমি মারমুখো কোনো লোক নই।
বালক বয়সেও আমি কোনো ফড়িং-এর
পাখনা ছিঁড়িনি,
প্রজাপতিকে আলপিন দিয়ে
আটকে রাখিনি কাগজে।
কখনো উড়ন্ত কিংবা গাছের ডালে বসে-থাকা
কোনো পাখির প্রতি তাক করিনি
বন্দুকের চকচকে নল।
ছায়াময় আশ্রয়ে সময়-পোহানো
পাখি,

বিকেলের আবীর মেখে দাঁড়ানো তন্বীর মতো
গাছ,
পলায়নপর সূর্যের চুমো-খাওয়া
নদী,
ইতস্তত ছড়িয়ে-থাকা খুচরো সিকি আধুলির মতো
তারা,
প্রত্যেকেই নিজস্ব ভাষায়
গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে শান্তির পাঁচালিতে।
দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আমি কান পাতি গোলাপ আর চন্দনের ব্রতকথায়।
যতদূর মনে করতে পারি,
কোনোদিন আমার ওষ্ঠ অস্ত্রবন্দনায়
স্ফুরিত হয়নি।
কিন্তু আমার ঘরে কেউ আগুন দিতে এলে,
আমার ভায়ের বুক কেউ বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিলে,
আমার বোনের রওশন চৌকি
কেউ তছনছ করে দিতে এলে,
নিরস্ত্র আমি নিমেষে হয়ে উঠি দুরন্ত লড়াকু।
আমার লড়াইয়ের রীতি
নদীর ফেরীর মতো; ফুল আর সুরের মতো
পবিত্র।
আমার কোমর কালো বেল্টে শোভিত হোক আর নাই হোক,
শেষ অব্দি লড়ে যাবো
অস্ত্রের প্রশ্রয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন।
না ছোরা, না ভোজালি, সড়কি না বল্লম,
না তলোয়ার না বন্দুক-

কিছুই নেই আমার,
এই আমি নিজেই আমার অস্ত্র।

ঈগল কি কাঁদে

নীলিমা-মনস্ক ঈগল কি কাঁদে পাহাড় চূড়ায়
শ্বাসরোধকারী একাকিত্বে কোনোদিন? এখন তো
খাচ্ছে সে ছোবল বয়সের; বুকের ভিতরে ঝড়,
হুহু ঝড়, অবসাদ নেশার মতন সঞ্চারিত
সমস্ত অস্তিত্বে তার। মাঝে-মাঝে আশেপাশে খোঁজে
সঙ্গিনীকে ভ্রান্তিবশে। শ্রান্তি চোখে তন্দ্রা হয় আর
পাহাড় চূড়ায় বাজে শূন্যতার গূঢ় টিটকিরি,
পালক পাপড়ির মতো উন্মীলিত মেঘছোঁয়া দুরন্ত হাওয়ায়।
স্মৃতিকে ঠুকরে তার দিন যায় কখনো কখনো
তন্ময় তাকিয়ে শূন্যতায়; কখনো বা ভয় পায়
ভবিষ্যের কথা ভেবে দুঃস্বপ্নের জালে বন্দি হয়ে
ভাবে সে পর্বতে নেই আর। শত জয়চিহ্নময় ঊর্ধ্বগামী
পাখা তার দ্যুতিহীন, ভীষণ বিবশ পড়ে আছে বড়ো একা
গলির ধুলায় খাদ্যহীন, পিপাসার্ত, কী অক্ষম।
ভাবে সে গলির মোড়ে খর্বকায় কেউ তার প্রতি
ধারে-কেনা সিগারেট, আধপোড়া, দ্যায় ছুঁড়ে কিংবা
কেউ খেলাচ্ছলে নিচ্ছে তুলে নিজস্ব পালক তার
অত্যন্ত রক্তাক্ত ক'রে তাকে অথবা বালক কেউ
কৌতূহলী জং-ধরা খাঁচায় পুরতে চায় তাকে।
কেউ কেউ তুড়ি মারে কালক্লিষ্ট মুখচ্ছিরি দেখে।

তবু কী যে হয়, আকাশের দিকে মেঘ উড়ে
যেতে দেখলেই তার পাখায় চাঞ্চল্য তরঙ্গিত,
সুদূরের ঘ্রাণে তাজু ক'রে একবিংশ শতাব্দীর
দিকে অহংকারীর মুগ্ধ চোখ রেখে সে আবার তার
পালকের গুচ্ছ থেকে অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দূর নীলিমায়
তুমুল তরঙ্গে ভেসে দ্যুতিময় প্রকৃত বিহঙ্গ হতে চায়।

এক দশক পরে

একটি দশক ছিল প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো,
কিছু বা কাটায় কীর্ণ, সেয়ানা কীটের
লোভ ছিল জেগে
সাপের মণির মতো, গণিকার প্রসাধন-চটা
বিশীর্ণ মুখের মতো ছিল রোগ শোক,
বিলাপে পড়েনি ভাটা, যদিও আনন্দ ধ্বনি প্রাণে
বুনেছে সৌন্দর্য, খৃষ্টপূর্ব শতকের
গোধুলি এসেছে নেমে সোনালি কুয়াশা হয়ে আর
হরিণের ছালে
ডোরাকাটা বাঘের মুখের লালা ঝরেছে নিয়ত।
একটি দশক আমি তার কথা জানতে পারিনি।
সে-কথা লুকোনো ছিল রোদপেড়ো পাতার আড়ালে,
লতাগুল্মে, পর্যটক মেঘে
দরবারী কানাড়ার পরতে পরতে,
সূর্যাস্তের অবসন্ন বিশদ মোটিফে,
ঈগল এবং রাগী সাপের বিবাদে।

একটি দশক আমি তার কথা জানতে পারিনি,
অথচ ছিল সে আশপাশে
বিকশিত রাগিনীর মতো। অকস্মাৎ
একটি গভীর রাত চন্দ্রমল্লিকার
সৌরভ বিলায় পোড়-খাওয়া অস্তিত্বের
অলিতে গলিতে,
নৈশ ঘ্রাণে ভরপুর স্বরের চুমোয়
প্লাস্টারের মতো খসে পড়ে দীর্ঘ দশটি বছর।
বয়সে গোলাপ ফোটে, সহসা যযাতি
পুরুরবা হয়ে যায়, ধাবমান পাঁচটি ঘোড়ার
ঘাম আর মুখের কবোষ্ণ ফেনা ঝরে
শিরায় শিরায়,
আমার প্রতিটি রোমকূপ
নিমেষেই ময়ূরের চোখ হয়। এক দশকের
দ্বিধা আর সংশয়ের সূর্যাস্তের পরে
বস্তুত সত্তার মৌন তটে
অপরূপ সখ্যে জেগে ওঠে দুলিয়ে চিত্রিত মাথা
মনসার গৌরবের মতো এক অনার্য সভ্যতা।

এক রাতে হযরত ওসমান

কে আমাকে এমন সতর্ক করে আজ বারংবার
ভয়ার্ত রাত্তিরে? ঘোড়াগুলি আস্তাবলে
করছে চিৎকার,

উটেরা উৎকর্ণ বড়। ওরা টের পায়,
ঘোর অমঙ্গল কাছে এলে ওরা টের পেয়ে যায়।
বেদনার্ত চোখ মেলে দেখি
আকাশে বিদ্যুচ্চমক ঘন ঘন,
অথচ বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।
আমি কি ছিলাম অন্ধ অথবা বধির?
আমার বিরুদ্ধে কত হাত
মরুভূর জহরিলা সাপের মতন
তুলেছে ব্যাপক ফণা ক্রমাগত, দেখতে পাইনি। কেউ কেউ
বলেছে আমার চতুর্দিকে ভয়ংকর ফাঁদ পাতা,
অথচ দিইনি কান রটনায় কোনোদিন। ওরা
আমার রক্তের লোভে ঘোরে
রাত্রিদিন শ্বাপদের মতো অন্তরালে,
কখনো প্রকাশ্যে জনসভা ক'রে শাসায় আমাকে-
যেন আমি অপরাধী আপাদমস্তক, যেন আমি
প্রিয় স্বদেশের জন্যে ফেলিনি মাথার ঘাম পায়ে,
আরববাসীর ধুধু পানিকষ্ট দ্রুত
লাঘবের জন্যে যেন
করিনি খনন কূপ শহরে শহরে,
গ্রাম-গ্রামান্তরে।
একবার ভেবে দেখ হে নগরবাসী
কে আমি, কী কাজ আমি করেছি নিঃশব্দে এতকাল।
বাজাইনি ঢাক ঢোল, আত্মপ্রচারের
মোহে নগরকে
কখনো দিইনি মুড়ে রঙিন কাগজে।
নিজেই নিজের কথা বলা

সমীচীন নয় কোনোকালে, তবু কিছু কথা বলি,
কেননা অত্যন্ত ক্ষীণ জানি জনস্মৃতি।
জনগণ যাতে সুখী হয়,
সেজন্যে এ-আমি
করেছি নির্মাণ পথ, বাঁধ, সুস্নিগ্ধ সরাই;
করেছি সত্যের জন্যে রোকেয়ার সঙ্গে
ন'বছর নির্বাসিত জীবনযাপন;
শত বিপর্যয়ে
রেখেছি নিজেকে খাড়া মসজিদের মিনারের মতো।
মানব কল্যাণ আর প্রগতি সর্বদা
ছিল ধ্রুবতারা
আমার জীবনে, কিন্তু যারা নিত্য বিপক্ষে আমার
করে কানাঘুষা,
দেয় অপবাদ
স্বজনপ্রীতি আর আমার সকল কাজে ধরে
খুঁত সর্বক্ষণ তারা
কলঙ্ক লেপন করে আমার নামের অবয়বে,
যেমন অবুঝ শিশু দোয়াত উপুড় করে সফেদ কাগজে
খেলাচ্ছলে। আমার বিরুদ্ধে ওরা নানান ফিকিরে
নিয়ত খেপিয়ে তোলে অগণিত মানুষকে শুধু।
আমার সকল কীর্তি যেন উটের পায়ের ছাপ
মরুর বালিতে-বাতাসের ঝটকায় মুছে যায়
নিমেষেই; হত্যাকারীগণ
হচ্ছে তৈরি অন্ধকারে, শানাচ্ছে বিষাক্ত হাতিয়ার
এবং অপ্রতিরোধ্য ওরা আসবেই দলে দলে
জোট বেঁধে বর্বর নেশায় মেতে। কিন্তু তারা মূঢ় অর্বাচীন;

জানে না যে-রক্ত ধারা বইবে আজ আমার শরীর থেকে তার
গতি থামবে না কোনোকোলে।
এই রক্তস্রোত
অবিরল বয়ে যাবে দশকে দশকে আর শতকে শতকে।

একটি ফ্রিজ শটের জন্যে

এ কেমন চলে যাওয়া উড়িয়ে রুমাল কাকডাকা
দুপুরে একাকী দূরে, বিন্দু হয়ে যাওয়া? দুটি পাখি
ছিল ডালে; শাখাচারী পক্ষীদ্বয় দু' ফোঁটা চোখের
পানি যেন। ভুরুর মতন ঝিল, শিকের আড়ালে
কতিপয় প্রাণী আর রঙিন চাঞ্চল্য আপাতত
ভাস্কর্য আমার মনে। দুপুরেই চৌরাহায় আজ
হঠাৎ গোধূলি আসে ব্যেপে। একটু আগেই ছিলে
আমার হাতকে সভ্যতার চারু কারুকাজ ক'রে।
এখনো কাটেনি ঘোর সান্নিধ্যের; মদ্যপের মতো
সম্মুখে তাকিয়ে আছি; আশপাশে ধুম বিলাবাট্টা
হয় হোক, নেই চোখ কান সেদিকে আমার। প্রাণ
গুণীর পুষ্পিত তান তোমার সৌরভে। এই পাখি,
পাতার টোপর-পরা গাছ, আমাদের প্রসারিত
ব্যগ্র হাত কেন ফ্রিজ শট হয়ে যায়না নিমেষে?

কবির নির্বাসন

আমার চোখ কি আমার কাছ থেকে
নির্বাসিত হয়েছে
নইলে কেন আমি কোন কিছু
দেখতে পাচ্ছি না?
আমার কণ্ঠ কি আমার কাছে থেকে
নির্বাসিত হয়েছে?
নইলে কেন আমার কণ্ঠ থেকে সত্য কি মিথ্যা কিছুই
উচ্চারিত হচ্ছে না?
আমার পা দুটো কি আমার কাছ থেকে
নির্বাসিত হয়েছে?
নইলে কেন ওরা সামনের দিকে
এগোতে পারছে না?
আমার হাত দুটো কি আমার কাছ থেকে
নির্বাসিত হয়েছে?
নইলে কেন ওরা এত লঙ্কাকাণ্ডের পরেও
মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে না?
আমার কলম কি আমার কাছ থেকে
নির্বাসিত হয়েছে?
নইলে কেন আমি খাতার পাতায় উচ্চারণের স্তবক
ফোটাতে পারছি না?

কালঘুম

কথা ছিল না। আমরা যারা বুকের ভেতর ফুল, ধুলো আর আলকাতরার
গন্ধমাখা হাওয়া টেনে নিই, সিগারেট ধরাই, সিনেমায় ভিড় বাড়াই, আপিশ

করি আড্ডা দিই, বিছানায় যাই স্ত্রীর সঙ্গে, তাদের অনেকের বেঁচে থাকার কথা ছিল না।

ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরলাম রাতে। রাস্তায় কুসংস্কারের মতো অন্ধকার। বাড়িটার সামনে এসে চমকে উঠি। খুব অচেনা মনে হয়। এর দেয়াল, দরজা, ছাদের কার্নিশ কিছুই যেন আগে দেখিনি। অথচ এই বাড়িতেই আমার নিত্যদিনের আসা-যাওয়া; রৌদ্র আর জ্যোৎস্নাপায়ী এ-বাড়ি আমার মুখস্থ। আর মুগ্ধাবেশে চেয়ে থাকি কখনো কড়িকাঠের দিকে, কখনো বা পুরানো জানালার নির্জনতায়।

সারাদিন এক অস্বস্তি ছিল রোদে, হাওয়ায়। যেন রোদ আর হাওয়া থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে। চলে যেতে হবে জাহাজডুবির অসহায় যাত্রীর মতো। এই অস্বস্তি প্লেগের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহরে। একটা চাপা উত্তেজনা পথচারীদের দখল করে রেখেছে। ওরা অপেক্ষমাণ কিছু একটার জন্যে, যেমন নিদ্রামগ্ন চোখ স্বপ্নাচ্ছন্নতায় মেতে থাকে প্রত্যুষের প্রতীক্ষায়। ব্যাকা-ট্যারা গলির মোড়ে, পথের ধারে অফিসের কামরায়, করিডোরে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছে কয়েকজন। সেই মুহূর্তে কোনো ভাবোল্লাস তাদের মধ্যে তরঙ্গিত হচ্ছিলো কিনা জানি না।

সারাদিনের পর স্টেডিয়ামের বইয়ের দোকানে সন্ধ্যা কাটিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফিরি। সচরাচর এত তাড়াতাড়ি বাড়িমুখো হই না। উৎকণ্ঠা নিয়ে রাতে খাবার খেলাম, এলোমেলো কিছু ভাবলাম, তারপর যথারীতি গেলাম বিছানায়। বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মরহুম পিতার কথা মনে পড়লো। তাঁর উপস্থিতি টের পাই ঘরে। তাঁর পরনে সেই শাদা পাঞ্জাবি আর পা-জামা, মাথায় কালো মখমলী টুপি, হাতে লাঠি। লাঠির মুণ্ডে লতাপাতার নক্‌শা। হঠাৎ আমার ঘরে কেন তাঁর এই উপস্থিতি? তিনি কি আমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছেন, যাতে কোনো খানা-খন্দে আমি মুখ থুবড়ে না পাড়ি? কিন্তু তিনি কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ করেননি। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন পারলৌকিক উদাসীনতায়। ওল্ড টেস্টামেন্টের কোনে বর্ষীয়ান পয়গম্বরের

মতো মনে হচ্ছিল তাঁকে, বিশেষত তাঁর টিকালো নাক আর সফেদ দাড়ির জন্য। এই দৃশ্যে এক ধরনের মহিমা ছিল। আমার পিতার কাছে অনেক কিছু শিখেছি আমি। কিন্তু সেই মুহূর্তে কেবল মনে পড়ছিল, তাঁর শেখানো একটা প্রবাদ-'খোঁড়ার পা খালেই পড়ে। কেন মনে পড়ছিল, বলতে পারবো না। আমার পিতার গানের গলা ছিল না। বরং তিনি ছিলেন প্রকৃতই সুরছুট। তাঁর কণ্ঠে গাম্ভীর্য ছিল, ছিল না মাধুর্য। গান তিনি গাইতেন না। তবে কখনো কখনো বিছানায় শুয়ে-শুয়ে গুন গুন করতেন। শুধু একটি গানের বেসুরো গুঞ্জরণ শুনেছি তাঁর কণ্ঠে বারংবার 'দিন ফুরালো, সমঝে চলো'-এই ক'টি শব্দ ছাড়া সে গানের কোনো কথা আমার মনে পড়ে না।

আমার লেখার টেবিলের কাছে রাখা শূন্য চেয়ারটিতে তিনি বসে আছেন। নিঃসাড়, নিশ্চুপ। আমি উঠে বসতে চাই। তাঁকে তাজিম দেখানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু পারি না। আমাকে কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে বিছানায়। আমি ছটফট করছি শয্যাত্যাগের জন্যে, পিতার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। শয্যাবন্দি আমি বাক্ শক্তিরহিত। জনক তাঁর পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন ভাবলেশহীন। ঘরের ভেতর কয়েকটি শজারু আর উড়ুক্কু মাছ। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ওদের প্রতি, যেন তিনি ওদের নিয়ে এসেছেন সঙ্গে লাঠির সংকেতে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি। শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। গাছের গুঁড়ির মতো ঘুমোতে থাকি। ঘর কেঁপে ওঠে বারবার, ঘুমের ভেতরে টের পাই। তখন ক'টা বাজে জানতে পারিনি। ঘড়ি দেখার মতো উৎসাহ ছিল না এত ক্লান্ত ছিলাম সে-রাতে। গাঢ় ঘুমে চোখ বুঝে আসছিল। ভয়ংকর শব্দসমূহ সেই ঘুমে সামান্য চিড় ধড়িয়ে ছিল মাত্র তার বেশি কিছু নয়।

মাতাল যেমন সাময়িক মতিচ্ছন্নতায় বোধের বাইরে পড়ে থাকে, তেমনি আমি ছিলাম সে-রাতে। আমার সীমাহীন অবসাদ, নিষ্ক্রিয়তা আর পাথুরে ঘুম আমার শয্যাসঙ্গিনীর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। মাঝে মাঝে ভয়ানক শব্দ শুনে চমকে-ওঠা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না আমাদের। ঘুমন্ত আমরা টের পাইনি কি ভয়াবহ এক সকাল অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

একটি সকাল কী ভীষণ বদলে দিলো সন্ত্রস্ত আমাকে আর ভিন-দেশী
জেনারেলদের বুটজুতোয় থেঁৎলে-যাওয়া, বুলেটের ঝড়ে ক্ষত-বিক্ষত আমার
আপন শহরকে।

গুড মর্নিং বাংলাদেশ

গুড মর্নিং বাংলাদেশ, সুপ্রভাত,
হাউ ডু ইউ ডু?
সুপ্রভাত সাতরওজা, মাহুৎটুলি নবাবপুর,
বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, পুরানা পল্টন;
সুপ্রভাত বাগেরহাট, মহাস্থানগড়, ময়নামতি,
সুপ্রভাত পলাশতলী, পাড়াতলী,
সুপ্রভাত আদিয়াবাদের খাল, তাল তমাল হিন্তাল,
নিতাই জেলের জাল, কাশেম মাঝির নাও,
বঁইচি ফুল, কামেলার কানের দুল,
সুপ্রভাত বরিশাল, সুনামগঞ্জ তেঁতুলিয়া, টেকনাফ,
সুপ্রভাত বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা,
সুরমা, কর্ণফুলী।
গুড মর্নিং বাংলাদেশ, সুপ্রভাত,
তুমি কেমন আছো?
বাংলাদেশ, কখনো তুমি ডুরে শাড়ি পরে
ধান ভানো, কখনো জীন্‌স পরে মেতে ওঠো
ডিসকো নাচে।
কখনো তুমি কলসি কাঁখে জলকে যাও, কখনোবা
পুকুরঘাটে গল্প করো, সুন্দর একটা পাখি দেখে ভাসো

খুশির ঢেইয়ে, গ্রীষ্মের দুপুরে তালপাতার
পাখা দিয়ে বাতাস ক'রে
ঘুম পাড়াও পঞ্চম সন্তানকে; পান, সুপুরি এগিয়ে দাও
অতিথির দিকে, রাঁধো পাব্‌দা মাছের সালুন;
পৌষালী রাতে একা একা তৈরী করো
নক্‌শি কাঁথা। দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়।
বাংলাদেশ, যারা তোমার সংস্কৃতির পাছায়
চিমটি কাটে, ঘষে দেয় বিষলতা,
আল্লাহ তাদের হায়াত দরাজ করুন।
যারা তোমার বাজু থেকে কেয়ূর,
নাক থেকে নোলক আর নাকছাবি,
গলা থেকে হাঁসুলি,
কোমর থেকে বিছাহার খুলে নিয়ে
পাচার করে দেশান্তরে,
আল্লাহ তাদের হায়াত দরাজ করুন,
যেসব ধাপ্পাবাজ সুদিনের সপক্ষে মিথ্যার থুতু ছিটায়,
আল্লাহ তাদের হায়াত দরাজ করুন
শোনো বাংলাদেশ, স্বপ্নের ফেনা লেগে তোমার চোখ
এমন অন্ধ হয়ে যায়নি যে, তুমি
দেখতে পাচ্ছো না শকুনের ঝাঁক বড়শির মতো নখ দিয়ে
আকাশের উদর ছিঁড়ে খুঁড়ে হিঁচড়ে টেনে আনছে
মেঘের নাড়িভুঁড়ি;
দেখতে পাচ্ছো না সংসদ ভবন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে,
রাজনীতিবিদগণ জনগণের কাছ থেকে
বিছিন্ন হয়ে বনভোজন করছেন দীর্ঘকাল;
শাসনতন্ত্র কাটা ঘুড়ির মতো ভাসমান,

উন্নয়ন বিশারদগণ পাঁচসালা পরিকল্পনাকে
কুরে কুরে খাচ্ছেন ঘুণের ধরনের।
দেখতে পাচ্ছো না বখাটে বুদ্ধিজীবীদের মাথায়
বেধড়ক উৎসাহে ক্রমাগত হাগছে প্যাঁচা আর বাদুড়,
দেখতে পাচ্ছো না, সাত ঘাট থেকে চেয়ে-চিন্তে-আনা
হে ব্যর্থ অন্নপূর্ণা,
যে, তোমার সন্তানের পাতের ভাত খায় সাত কাকে।
গুড মর্নিং বাংলাদেশ সুপ্রভাত
হাউ ডু ইউ ডু?
তুমি কি জেল্লাদার হ্যাট-কোট-পরা শাঁসালো বিদেশীকে দেখে
তোমার উরুদ্বয় ফাঁক করে দেবে নিমেষে?
আমি আমার আগুন-ওগড়ানো চোখ হ্যামলেটের মতো
এখন সরিয়ে নিচ্ছি বটে, কিন্তু হে ধর্ষিতা,
বারবার আমি আমার লড়াকু হাত-পাগুলোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে
রাখতে পারবো কি?

ঘুম

ঘুমাতে পারোনা তুমি কত দীর্ঘকাল।
ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের একটানা
ডাক সঙ্গে নিয়ে চাঁদ ডুবে যায় ছাদের কার্নিশে
অস্ফুট প্রত্যুষ হাত রাখে,
ঘুমাতে পারোনা তুমি। চোখ দুটো খুব রাতজাগা
পাখির চোখের মতো হয়ে আসে ক্রমে,
জ্বালা করে; মাথা ধরে। মুখের ভেতর

নোনা স্বাদ আর
হৃদয়ের ভিতর মহলে
শোলা ডোবে এবং পাথর ভাসে, ভাসে বাল্যকাল।
ঘুমাতে পারোনা তুমি কত দীর্ঘকাল।
এখুনি আসবে এই বারান্দায় চড়ুইয়ের দল
নরম রুটির লোভে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তুমি
দেখবে চাঞ্চল্য ইতস্তত,
রুটির গুঁড়োর মতো ঝরবে ওদের
কণ্ঠস্বর, শোনা যাবে। টুকরো টুকরো রুটি
ছুঁড়ে দিয়ে চলে যেও ফের বিছানায়;
এখন ঘুমাও তুমি, ঘুমাতে পারোনি দীর্ঘকাল।

চাষাবাদ

এত পথ হেঁটে এসে কেন তুমি থমকে দাঁড়ালে?
দেখছো কি নিভৃত আড়ালে
সহসা এমন কিছু যা শোণিতে ছড়ায় নিমেষে
অজস্র তুষার কণা অথবা চতুর ছদ্মবেশে
দাঁড়ায় নিকটে এসে আতঙ্ক ভয়াল?
নাকি কোনো মন্থর ময়াল
পথ রোখে রাজসিক হেলায়? যাক হোক,
ভয়ে তুমি বন্ধ করোনা দু’ চোখ।
এই তো গন্তব্য এসে গেল বলে। দূরে
রূপসীর হারের দ্যুতির মতো আলো শিহরিত, সুরে সুরে

গুঞ্জরিত দশদিকে। করোনা মন্থর
স্বাভাবিক গতি, দেখছো না ফুটে আছে কত জুঁই ও টগর-
পথপ্রান্তে, বুক ভ'রে গন্ধ নিয়ে জোরে শুরু হবে
বেনজির চাষাবাদ বিপুল বৈভবে।

চোর

শৌখিন আগ্রহে নয়, নয় খেলাচ্ছলে, এসেছিল
আলাভোলা লোকটা এখানে টিনশেডে চুপিসারে
বাঁচাতে নিজস্ব মাথা শিলাবৃষ্টি থেকে। বিপন্ন সে
এসেছিল ভয়ার্ত প্রাণীর মতো বৃষ্টির আঁচড়ে
জব্দ; বাতাসের শব্দ অসংখ্য আহত হায়েনার
ভীষণ গোঙানি যেন। মাঝে মাঝে বাইরে নজর
রেখেছিল লোকটা ঝড়ের রোখ বুঝে নিতে।
নিজেকে অভয় দিতে হয়তো গেয়েছিল গীত
এলোমেলো ভাঙা স্বরে খুব সন্তর্পণে। অকস্মাৎ
টিনশেডে এল ছুটে কতিপয় অতিশয় রাগী
লোক, তারপর চোর ভ্রমে আলাভোলা গায়কের
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জান্তর আক্রোশে। ঝড় জল
থেকে যায়, মিটিয়ে হাতের সুখ ফিরে যায় ওরা;
মৃত্যু তাকে নিয়ে গেল তস্করের মতো আচরণে।

ছায়াবিলাস

সিকি শতাব্দী আগের কথা, খুব সকালবেলা
ঘুম ভাঙলো আমার, দেখি
সূর্য রূপদক্ষ রঙরেজের মতো
রোদের পোঁচড়ায় রাঙিয়ে দিচ্ছে দশদিক,
আর সদ্য-হাঁটতে-শেখা আমার ছেলে মাতালের ধরনে
এগিয়ে যাচ্ছে দেওয়ালের দিকে। ওর ছোট্ট ছায়া
পড়েছে দেওয়ালে আর দৃষ্টিতে
রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে সে দেখছে নিজের ছায়াটিকে।
সেই মুহূর্তে কী ভাবছিলো সেই শিশু,
আমার সন্তান? ভাবছিলো কি ওর জন্যে নতুন ধরনের
একটা খেলনা টানানো রয়েছে দেওয়ালে?
হয়তো খেলনা মনে করেই
সে তার দশটি ব্যগ্র আঙ্গুল দিয়ে
ছুঁতে চাইছিলো নিজস্ব ছায়া।
শেষ অব্দি
ছায়া খুটে বস্তুত কিছুই পাওয়া যায় না,
এই সামান্য কথাটা বোঝার জন্যে
ওকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে।
বর্তমানে আমার ছেলের বয়স পঁচিশ। এখন সে
অনেক কিছুর সঙ্গেই
দিব্যি বোঝাপড়া করে নিতে পারে,
শৈশবে যা ছিল ওর সাধ্যাতীত। কেউ কেউ বলে,
কোনো কোনো ব্যাপারে
আমার সঙ্গে ওর নাকি প্রচুর মিল।

ঝাঁকড়া চুল আঁচড়াবার সময়
ওর মুখে যে ভঙ্গি ফোটে
তা হুবহু আমার মুখভঙ্গি। টেলিফোনে
ওর গলা শুনে অনেকে
আমার কণ্ঠস্বর বলে ভুল করে এবং
মাঝে-মধ্যে ওর মা বলেন, ‘ও যখন কাছে আসে,
তখন আমি তোমার অস্তিত্বের ঘ্রাণ পাই।‘
সর্বোপরি আমার পুত্র
আমার মতই ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত
এবং কিছুটা উড়নচণ্ডী।
কী জানেন, আমাদের দু’জনের মধ্যে
অমিল ও নেহাত কম নয়। আমি বেড়াল পছন্দ করি,
সে পুষতে চায় কুকুর;
আমি একদিন অন্তর ক্লান শেভ করি আর সে
গজিয়েছে স্তালিনের মতো গোঁফ;
অবিশ্বাসের আদিগন্ত অমাবস্যায়
আমি এক বিভ্রান্ত পর্যটক,
তার আঁজলায় টলটলে জলের মতো
বিশ্বাসের আলো। আমি ছায়াবিলাসী
আর সে নিজেরই ছায়া দেখে চমকে ওঠে যখন তখন।

টাইরেসিয়াসের মতো

দোরগোড়ায় রোজ বসে থাকতো

যে-লোকটা, আলো সম্পর্কে কোনো
ধারণাই ছিল না তার।
কারণ, সে ছিল জন্মান্ধ। ফলত
আরো অনেক কিছুর মতোই আলো নিয়ে
সে কোনোদিন ওর কাঁচাপাকা চুল-ভর্তি
মাথাটা ঘামায়নি।
দোরগোড়ায় হামেশা বসতো লোকটা,
কিন্তু কুঁড়েমি
ওর ধাতস্থ হয়নি কস্মিনকালেও।
ভোরবেলার আলো তার সত্তায় খেলা করতো,
ওর জানা ছিল না। ভিক্ষা-টিক্ষা
করার কথা আদৌ সে ভাবেনি, তাই
ওর দশটি আঙুলের শ্রমশোভন নাচে
বাঁশের কঞ্চিগুলো হয়ে উঠতো শিল্পসামগ্রী।
এবং এতেই
গরম থাকতো ওর উনুন।
একদিন সমুদ্র গর্জনের মতো
কী একটা ওর কানের ঘুলঘুলিতে
আছড়ে পড়ে। চারদিক থেকে রব ওঠে-
মিছিল, মিছিল।
হঠাৎ বাঁশের চুব্‌ড়ি থেকে হাত সরিয়ে
গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে লোকটা। কী যেন
ভাবে কিছুক্ষণ, তারপর লাঠি হাতে
এগোতে থাকে
সামনের দিকে জন্মন্ধ দৃষ্টি মেলে দিয়ে।
তেজী মিছিল ওকে টেনে নিলো,

যেমন সমুদ্র মিলনোম্মুখ নদীকে।
লোকটা আর ফিরে আসেনি
দোরগোড়ায়।
হয়তো সে টাইরেসিয়াসের মতো
একটা জ্যোতির্বলয় দেখতে পেয়েছিল সেই মিছিলে।

তুমি মিথ্যা বলেছিলে

আমার এই পুরোনো ঘরের ভেতরে আলো
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বাইরে।
পাখিটাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে
আমি রোজকার মতো আজো
চোখ কচলাতে কচলাতে
জেগে উঠলাম।
তাকালাম চাদ্দিকে,
একটা প্রত্যাশা নিয়ে,
না আমি আমার সেই
আকাঙ্ক্ষিত সূর্যোদয় ধারে কাছে
কোথাও দেখতে পেলাম না।
আজ একথা আমার কাছে আমার
হাতের রেখার মতোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে,
তুমি মিথ্যা বলেছিলে, জাভেদ
তুমি বলেছিলে-আমার মনে পড়ছে
এইতো আমি তোমার সেই
কণ্ঠস্বর শুনতে পাই;

ঝড়ে পড়া জাহাজের কাপ্তান যেমন তার
নাবিকদের উদ্দেশে বলেন-
তুমিও তেমনি বলেছিলে-
এই আবলুশ কাঠের মতো অন্ধকারই শেষ কথা নয়।
আমাদের সামনে এক নতুন সূর্যোদয়
যা ভবিষ্যৎ রাঙা পোস্টারের মতো টানিয়ে দেবে,
আমরা সবাই জোরে শোরে হাততালি দিয়েছিলাম সেদিন
তোমার সেই উচ্চারণে।
আমার শিথিল পেশীগুলি সেদিন
টান টান হয়ে গিয়েছিল-
আমার চোখে উড়ে এসে বসেছিল
স্বপ্নের অজস্র পাখি-
পোস্টম্যানের মতো হনহনিয়ে চলেছে
সময়।
পাড়ার ইয়াসিন দর্জি বয়সের ভারে বেঁকে
ঈদের চাঁদের মতো হয়ে গেছে,
নেয়ামত ওস্তাগার পুব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
অন্ধ হয়ে গেল জাভেদ
রিকশাঅলা তার নুন আনতে পান্তা ফুরানো
সংসারটাকে বিরান ক'রে,
হাড়গুলোকে জুড়োতে চলে গেল কব্বরে
এই দ্যাখো জাভেদ আমার কালো চুল
দেখতে দেখতে কেমন শাদা হয়ে গেল,
জাভেদ আজ আমি জেনে গেছি
তুমি একটা মিথ্যাকে সত্যের সাজ পরিয়ে
ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে নাচুনে

বানরের মতো ছেড়ে দিয়েছিলে আমাদের সামনে।
জাবেদ ভেবনা আমি তোমার নিন্দামন্দ
করার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছি; আমি জানি
অনেক মোটা মোটা বইয়ের সূক্ষ্ম আলো
তোমার মনের ঘুলঘুলিতে খেলা করে অষ্টপ্রহর
বহুবার জেলখাটা তোমার শরীরে
মনীষার ভাস্বর ছায়া পড়ে
একথা আমার অজানা নয়;
তোমার কাছে ঋণের আমার অন্ত নেই জাভেদ
তুমিই প্রথম আমাকে একটা আশ্চর্য
সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলে।
আমার চির আকাঙ্ক্ষিত সেই সূর্যোদয়
এখনো নাই বা এল সেই স্বপ্নটা আছে তো
আর স্বপ্ন আছে বলেই তো।

দুপুর, একটি পাণ্ডুলিপি

সেদিন দুপুরে, নিরালায়, যা প্রান্তর, লীলায়িত সুনসান,
সহজে তোমাকে ছুঁতে পারতাম যে কোনো ছুঁতোয়।
তোমার আঙুলগুলো টেবিলের কাছে ফুটেছিল,
আমি সৌন্দর্যের ডাগরতা পারতাম ছুঁতে। তুমি
যে স্পন্দিত পাণ্ডুলিপি থেকে
জ্যোৎস্নাচর অক্ষরের পাখি, ঝাঁক-ঝাঁক,
কোমল দিচ্ছিলে ছেড়ে ক্রমাগত, আমি
তা পরখ করার ছলে

প্রথম তোমার করস্পর্শে শিহরিত
হতে পারতাম, হয়তো উঠতো ফুটে চকিতে আমার
নিজস্ব উদ্ভিন্ন অন্ধকারে
প্রথম কদম ফুল কিংবা বংশীধ্বনি হয়ে তোমার সত্তার
গহনে মিলিয়ে যেতে পারতাম, চোখে
চোখ রেখে করা যেতো হৃদয়ের আদি উচ্চারণ।
করিনি কিছুই। শুধু দেখেছি তোমাকে সে দুপুরে
হৃদয়ের মধ্যদিনে যতোটুকু দেখা যায়।
তুমিই যৌবন দেখি, দেখি
যৌবনে নদীর বাঁক আছে, আছে তরঙ্গ সকল
কূল-উপচানো, আর উড়ন্ত পাখির প্রিয় ডাক,
গহন আশ্বিন, অনাদৃত ফুলের বিস্ময়,
উদাসীন পথিকের দেশ-রাগাশ্রয়ী
গীত।
ভরদুপুরকে নিমেষেই সন্ধ্যা ক'রে
তুমি চলে গেলে।
মাংসের দেয়ালে বাজে শত শত অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি,
মাংসের ভেতরে ফোটে অনিদ্রার রক্তিম কুসুম,
মাংসের ভেতরে তিনজন অন্ধ গায়কের দীপকের তান,
মাংসের ভেতরে তীব্র স্পন্দিত বৈষ্ণব পদাবলি,
মাংসের ভেতরে কী মোহন বিস্ফোরণ,
মাংসের ভেতরে অবলুপ্ত খৃষ্ট-পূর্ব সভ্যতার জাগরণ!
তুমিতো জানো না
যখন বিদায় নাও তুমি স্মিত হেসে,
ঔদাস্যে কখনো,
আমার ঘরের

যাবতীয় আসবাবপত্র
উড়ে চলে যায় দূরে। কেবল তোমার হস্তধৃত পাণ্ডুলিপি
গুণীর তানের মতো মধুর কাঁপতে থাকে ঘরে, বারে বারে
মনে হয়, সেই পাণ্ডুলিপি বিলি করবার লোভে
কে এক নাছোড়
স্মৃতিময় পোস্টম্যান বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সকল সময়
বন্দ ঘরে ভীষণ একাকি
গুজব রটনাকারী মানুষের মতো কিছু গল্প নিয়ে আমি
বসে থাকি শূন্যতায়, যেন বা অজ্ঞাতবাসে আছি।

দূরে থাকে ঘর

লোকটা একলা হাঁটে ফুটপাতে, পার্কে
বসে কিছুক্ষণ গাছ গাছালির মাঝে, শোনে ‘এ জগতে কার কে’
ব’লে একজন বৃদ্ধ, হয়তো ছিটগ্রস্ত, গেলেন বেরিয়ে,
যেন কোন ব্যর্থ, নিঃস্ব অভিনেতা। লোকটা এড়িয়ে
কৌতূহলী দৃষ্টি বেঞ্চি ছেড়ে উঠে যায়,
এবং তাকায় আশপাশে, আত্মসুখে বুঁদ, দ্যাখে বসন্ত জাগ্রত
তরুণীর যৌবনের মতো।
লোকটা কখনো ঘাসে কখনো আকাশে
চোখ রাখে, কখনোবা নীল মসজিদের গম্বজের
অনেক ওপরে উড়ে যায়, মেঘে ভাসে;
ইচ্ছে হলে ফের
পাতালে প্রবেশ ক’রে, জলপুরী দেখে
কাটার প্রহর;

জলকিন্নরীর কথা বলে, গাঢ় চুমো এঁকে
ওদের অধর
কেমন রাঙিয়ে দেয়, কখনো বা বিরান উদ্যানে
জাগায় ফুলের গুচ্ছ শুকনো গাছে ফের গানে গানে।
বড় বেশি জনহীন পথে লোকটা একাকী হাঁটে
শিস্ দিতে দিতে, ভাবে পা রাখবে সোনালি চৌকাঠে
ঝেড়ে ফেলে ধুলোবালি শান্ত বেলাশেষে।
অকস্মাৎ কী-যে হয়, দূরে থাকে ঘর,
নিমেষে সে মেশে
অক্ষরের ভিড়ে, হয়ে যায় অলৌকিক কণ্ঠস্বর।

পাইথন

আসলে ব্যাপার হলো, এখন আমরা
একটা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুরঘুট্টি
অন্ধকারে কেউ কারো মুখ
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না; অন্ধের মতো
এ ওকোঁ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, খুঁজছি
ভালো ক'রে দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা।
একটু পরেই হয়তো আলোর আবীর
ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু যতক্ষণ না পড়ে ততক্ষণ
আমাদের সর্তক থাকার পালা,
যাতে পা হড়কে অতল খাদে না পড়ে যাই।
আমার পিছনে ফেলে এসেছি
অনেক খানাখন্দ, চোরাবালি; বহু বালিয়াড়ি

পাড়ি দিয়েছি-আমাদের চামড়া
ঝলসে গেছে রোদের অত্যাচারী চুমোয়,
আমাদের পাগুলো এখন সীসার মতো ভারী;
দীর্ঘ অনাহারে শীর্ণ, কায়ক্লেশে
নিজেদের টেনে হিঁচড়ে কোনোমতে
নিয়ে এসেছি এই খাদের কিনারে।
এক পা একা পা ক'রে আরেকটু এগোলে
কী নজরে পড়বে, জানিনা।
হয়তো খুব কাছেই একটা পাইথন
ভীষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে,
যে-কোনো মুহূর্তে নড়ে উঠতে পারে
আমাদের গিলে খাওয়ার জন্যে,
ভাবতেই ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ,
বুকের রক্ত হিম।
এই পাইথনের কথা অজানা নয় কারো;
কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে
চারদিকে রটানো হয়েছে ওর কীর্তিগাঁথা।
ইতোমধ্যে ঢের ছাগল,
ভেড়া,
হরিণ,
শুয়োর
এবং মানুষ
শিকার হয়েছে ওর। আমাদের আগে যারা এসেছিল
এই পথে, তারা কেউ গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি,
একে একে সবাই ফৌত হয়ে গেছে
পাইথনের স্বেচ্ছাচারে।

এই গিরিখাদ পেরুতে পারলেই
একটি নদীর রূপালি কল্লোল শুনতে পাবো
দৃষ্টি সবুজ করে দিয়ে
উচ্ছ্বসিত হবে শস্যের মাঠ, শত শত
শিশুর কণ্ঠস্বর পাখির গানের ঝংকৃত ছায়া
বুনে দেবে স্মৃতিতে।
ভয়ের গলায় পা রেখে,
পাইথনের বিখ্যাত ক্ষুধায় ধুলো দিয়ে
যত কষ্টই হোক, সামনের দিকে নজর রেখে
এখন একটু পা চালানো দরকার।
পাইথনের আড়মোড়া ভাঙার ধরনের আমাদের
পায়ের তলায় মাটি নড়ে উঠছে
ঘন ঘন। তবে কি এখন
শুরু হবে ভয়ংকর সেই ভূমিকম্প, যার ধমকে
টাল সামলাতে না পেরে
পাইথনটা নিজেই পড়ে যাবে অতল গিরিখাদে?

পুরোনো দিনের টানে

পুরোনো দিনের টানে মাঝে-মধ্যে এখনো সকালে
অথবা বিকেলে কিংবা ভর সন্ধ্যেবেলা
তসলিম রশিদের কাছে যাই। আমার নিজের
বাসা থেকে ওর
বাসগৃহ বেশ দূরে আরশি নগর

বলা যায়, যদিও পড়শি নেই কোন তার প্রকৃতি প্রস্তাবে।
কখনো কখনো তার সঙ্গে হয় না আমার দেখা
মাসাধিক কাল।
কখনো বা দেখা পেয়ে যাই।
তসলিম রশিদের বয়স হয়েছে ইদানীং।
মানে তার চুলে চকখড়ি গাঢ় দিয়েছে বুলিয়ে
উদাসীন শিল্পী এক। এখন সে লেখে না কবিতা
রাত জেগে থাকে না তাকিয়ে
নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা আকাশের দিকে। আজকাল
সহজে আসে না ঘুম, নিয়মিত খায় সেডাকসান।
গায় না সে মিছিলের গান গলা ছেড়ে, পাখিটাখি
দেখে না ঝিলের ধারে, থাকে
নিজের ভেতর নিজেকেই লুকিয়ে চুরিয়ে রেখে।
তিন তাসে মজেছে সে, শোনা যায়, এবং আকণ্ঠ দিশি
মদ গিলে বেহুঁশ বাসায় ফেরে মধ্যরাতে,
নিজেরই ছায়ার মতো। কোনো কোনো রাতে
বাহিরকে করে ঘর বিলাবাজ ইয়ারের সঙ্গে। খিস্তি করে,
বমিতে ভাসায় ঘর মাঝে-সাঝে। যদি কেউ তাকে
কবিতার কথা বলে খেলাচ্ছলে, তবে
বেধড়ক ক্ষেপে ওঠে যাঁলবোর ধরনে।
কী এক জটিল জালে স্বেচ্ছাবন্দি, দলে দলে মাকড়সা তার
চোয়ালে, কপালে, গালে, গলায়, বুকের কাছে ঘোরে
দিনরাত, অথচ পায় না টের, যেন
হারিয়ে ফেলেছে বোধ, রোজ
হাঁটাচলা করে নিজের অনুকরণে,
লতাগুল্ম, পাখি থেকে দূরে,

ক্রমান্বয়ে কংক্রিটের অবয়বে নিঝুম আশ্রয় পেতে চায়।
কতদিন ভাবি তসলিম রশিদের কাছে যাবো না কখনো
আর দূরে সেই
আরশি নগরে,
নিজের অজান্তে তবু বার বার সেখানেই যাই, চলে যাই।

বন্ধ দরজার দিকে যায়

ভাবিনি কখনো আগে এরকম হবে।
এরকম ব'লে আমি ঠিক
কী বোঝাতে চাই, খুব সাবলীলভাবে
বলা মুশকিল।
দেখতো আমার মধ্যে আজ
আশ্চর্য কিছু কি পাও? মানে
এরকম কিছু যা দেখলে অকস্মাৎ
চমকে উঠতে হয়?
না, আমি আমার এই চেনা মুখমণ্ডলের কথা
বলছি না। আমার দু'চোখ
অক্ষিকোটরের ভেতরেই আছে, নাক
নাকের জায়গায় ঠিক। ঠোঁটেরও হয়নি স্থানান্তর।
বলা যায় খেয়ে দেয়ে নিত্য দাড়ি কামিয়ে এবং
স্বপ্ন দেখে দু'দিন আগেও যা ছিলাম, তা-ই আছি।
তবে কি স্বতন্ত্র কোনো প্রগাঢ় আবীর
দিয়েছে রাঙিয়ে আজ আমার গহন মর্মমূল?
নইলে কেন আমি

আমার ভিতরে বাদশাহী আমলের ঝাড় লণ্ঠনের শোভা
এবং ঝুলন্ত উদ্যানের অন্য বৈভব দেখে
নিজেই আটকে থাকি বিস্ময়ের ধু ধু রশ্মিজালে।
সরোদ বাজাতে আমি জানিনা, তবুও
সরোদের মতো বেজে ওঠে অস্তিত্ব আমার আর দেখি
আমার ভেতর থেকে বিশ বছরের যুবক বেরিয়ে এসে
জ্যোৎস্নার ঝালর ছিঁড়ে বন্ধ দরজার দিকে যায়।

বিকল্প

যখন আমার কেউ থাকে না,
তখনও সে থাকে। সকল সময় ওর ঠোঁটে
শরতের রোদ্দুরের মতো
হাসি জড়ানো। ওর ঘন কালো চুলের বিন্যাস
কখনো বিপর্যস্ত; শরীরের ঢেউ
স্বপ্নের নক্শা আঁকে অবিরত সন্ধ্যার
আবছা স্বপ্নাভায়, রাত্রির স্তব্ধতায়।
তার কাছে যেন আমি প্রার্থনা করি
ভালোবাসবার অবসর এবং অমিতরায়ের ধরনে
তার কানে কানে বলি, আমার ভালোবাসা নয়
ঘড়ার জল, ওতে আছে দিঘির সাঁতার। আমাদের
ভালোবাসাবাসি শেষ অব্দি টিকবে কিনা
জানিনা, তবে এই মুহূর্তগুলি
সত্যের জ্যোর্তবলয়ে ঘূর্ণ্যমান।
ওকে নিয়ে পার্কে বেড়াই বিকেল বেলা,

ফুচকা, চটপটি খাই, মাঝে-মধ্যে রেঁস্তরার
কেবিনে বসি; পায়ে পা ঘষি, চুমু চুমু
খেলা খেলি, একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমীর
গ্রন্থমেলায় যাই, কখনো পাশাপাশি
হাঁটি মীনাবাজারে।
কোনো কোনো মধ্যরাতে দেয়াল থেকে
নামিয়ে আনি তাকে,
চোখে তুলে নিই, আলিঙ্গন করি বারবার।
তখন হঠাৎ আমার ভেতর
জেগে ওঠে পাগলা মেহের আলি।

বড় রাস্তায়

ব্যাপারটা কী
ভেবে দেখেছেন একবারও?
যতবার যাত্রা শুরু করি, ততবারই
পা এসে ঠেকে সর্প কুণ্ডলীর মতো
এক কানাগলিতে।
এমন হবার কথা নয়, তবু হচ্ছে
বারবার একই রকম। কখনো কখনো আমার মনে হয়,
বিসমিল্লাতেই গলদ নিশ্চয়; নইলে
কেন এই পুনরাবৃত্তির গোলক ধাঁধায়
ঘুরপাক খেয়ে মরছি?
সত্যি বলতে কি, এই কৃষ্ণপক্ষে

হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি প্রকৃত পদপ্রদর্শকের
অভাব। সে কবে থেকে সোনার পিঁড়ি শূন্য
পড়ে আছে, বসবার কেউ নেই। বিখ্যাত
পথ প্রদর্শকদের মধ্যে কেউ পর্যটন বিভাগের
সৌজন্য টিকিট নিয়ে গেছেন দীর্ঘমেয়াদী বিদেশ ভ্রমণে,
কেউ বাতে পঙ্গু হয়ে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি,
কেউ বা পোকার খেলছেন অষ্টপ্রহর এবং
মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছেন
আকাশটা ঘোলাজলের ডোবা নাকি স্ফটিকের সমুদ্র।
ঢের হয়েছে, আর নয়। সাফ কথা,
কারো বাহারি গুলপট্রিতে আর মজবোনা,
দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো না কোনো ভুল সংকেতে,
পদপ্রদর্শক থাক আর নাই থাক
এবার পৌঁছুতে হবেই ভবিষ্যতের মতো বড় রাস্তায়।

ভালো থাকা না থাকা

বাইরে তাকিয়ে দেখি
রৌদ্রবিহীন সকাল,
আকাশ এঁটো পানিময় বাসন।
হঠাৎ বেজে উঠলো টেলিফোন, তোমার
কণ্ঠস্বর নিমেষে
আমার মনের ভেতর ছড়িয়ে দিলো
একরাশ রোদ। রিসিভার ক্রেডলে

রাখার আগে
তুমি বললে, ‘ভালো থেকো।
দিনকাল যা পড়েছে
ভালো থাকা দায়। তবু
‘ভালো থেকো’ এই শব্দযুগল আমার
চোখের সামনে মেলে দিলো
কিছু সুশ্রী ছবি। পালটে গেল একালবেলার
মুখ, আর সেই মুহূর্তে
জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ভাবলাম,
নিজের জন্যে না হলেও
কারোর জন্যে আমার ভালো থাকা দরকার।
কিন্তু ব্যাপার হলো এই,
ভালো থাকতে গিয়ে অনেক বাধার দেয়াল গুঁড়িয়ে
আমি এখন বিশাল এক অগ্নিকুণ্ডে
কী প্রবল ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

ভালো লাগে

কৈশোরে পৌঁছে
মাত্র দু’চার দিনের ফারাকে
একে একে বাপ-মা দু’জনকেই হারিয়ে ফেলে
মুতালিব আলি। প্রথমে
এক ব্যাপক অমাবস্যা কাফনের মতো এঁটে গেল
ওর সত্তায়। কিন্তু একদিন শরতের রোদ্দুর
ওর কৈশোরকে হাত ধরে পৌঁছে দিলো

যৌবনে।
মধ্য যৌবনে মুতালিব আলির
ঘরে এল এক-গা চমকিলা যৌবন নিয়ে
এক কনে। ওকে দেখলে অবশ্য
কু'চবরণ কন্যার মেঘবরণ চুলের কথা মনে পড়েনা।
কিন্তু একেবারে ফ্যালনাও নয়
সে মেয়ের রূপ। এক ধরনের মাধুর্য ওর
সারা মুখ জুড়ে
খেলা করে বিকেলবেলার আলোর মতো।
একদিন মুতালিব আলির খালি ঘরে
তার ঘরণীর কোলে মাণিকের
আভা ছড়িয়ে খোকা এল। দিন যায়, খোকা
মায়ের কোল ছেড়ে উঠোন পেরিয়ে
রাস্তায় যায়। মিছিলে আওয়াজ তোলে, সে আওয়াজে
দোলে সারি সারি কুর্শি,
চলে জোর কদম। গুলি খায়,
লুটিয়ে পড়ে ভবিষ্যতের দিকে মুখ রেখে।
বুকের একমাত্র মাণিককে হারিয়ে
মা বিলাপ করে। মুতালিব আলি কাঁচা-পাকা
চুলভর্তি মাথা নিয়ে
বসে থাকেন রঁদ্যার মূর্তির মতো। কাল, বিখ্যাত শুশ্রুষাকারী,
তাকে মাঝে মধ্যে রক্তকরবীর গুচ্ছ এবং
কোত্থেকে উড়ে-আসা
পাখির পুচ্ছ থেকে চোখ সরাতে দেয় না।
মুতালিব আলি অফিসে যান,
সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়

গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজেন পুরানো গানের।
এক হেমন্তসন্ধ্যায় মুতালিব আলির
গৃহিনী, জয়তুন খাতুন,
বুকের বাঁদিকটা চেপে ধরে টলে পড়লেন, সারা দুনিয়া
দুলে উঠলো খোকার শৈশবের দোলনার মতো! তারপর
আর তিনি উঠে দাঁড়াননি
গা ঝাড়া দিয়ে।
মুতালিব আলি এখন একা, ভীষণ একা,
একেবারে একা। এখন
তার জীবন যেন খুব সান্নাটা এক গোরস্তান।
দিন যায়, চুলে আরো বেশি পাক ধরে, মুখের ভাঁজগুলি
হয় গাঢ়তর। দিন যায়, পূর্ণিমারাতে
বলক-দেওয়া দুধের ফেনার মতো জ্যোৎস্না
ছড়িয়ে পড়ে উঠোনে, জানলা গলে
লুটিয়ে পড়ে খাঁখাঁ বিছানায়। দক্ষিণ দিক থেকে
এক ঝাঁক স্বপ্নের মতো হাওয়া আসে, ভালো লাগে,
মুতালিব আলির ভালো লাগে।

ভালোবাসা

‘ভালোবাসি’, এই কথাটি বলতে গিয়ে
কণ্ঠে লাগে সংকোচের ফাঁসি?
এমনতো নয়, ভালোবাসা এবার প্রথম
হৃদয় জুড়ে হলো পুষ্পরাশি।

ইতোমধ্যে তোমার আগে বহুজনই
আমার কাছে শুনেছে এই বাঁশি।
একে আমার অপরাধের কালো ভেবে
করুক লোকে নিত্য হাসাহাসি,
তুমি ঘৃণায় ও-মুখ তোমার সরাও যদি,
বলবো তবু বলবো ‘ভালোবাসি।

মরুভূমি-বিষয়ক পংক্তিমালা

মাঝে-মধ্যে স্বপ্নে আমি মরুভূমি দেখি, মরুভূমি
অতিকায় তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠের মতো প্রসারিত আমার সত্তায়।
বিদীর্ণ বেহালা, ছিন্ন ভিন্ন বেশভূষা, মর্চে-পড়া
নীল পানপাত্র আর ঘোড়ার করোটি নিয়ে ধুধু বালিয়াড়ি
পড়ে থাকে; পশুরাজ নিঃসঙ্গ রাজার মতো করে বিচরণ-
জ্যোৎস্না তার দু’চোখে, কেশরে।
মরুভূমি ক্রমশ বিস্তৃত হয় স্বপ্নের ভেতরে, কখনো-বা
স্বপ্নটাই মরুভূমি। আমি,
স্বপ্ন, মরুভূমি একাকার মাঝে-মাঝে
আমার জীবন, যে-জীবন পিছনে এসেছি ফেলে বহুকাল আগে,
স্বপ্নের ভেতরে জ্বলে যেন মরীচিকা; বর্তমান নিরুদ্দেশ।
একটি বিশাল প্রাণীভূক পুষ্প আমাকে ভীষণ
আকর্ষণ করে,
তার অভ্যন্তরে চলে যেতে থাকি দ্রুত শোকগাথা
আওড়াতে আওড়াতে-
সেই পুষ্পটিকে বর্তমান বলে শান্ত করতে

ইচ্ছে হয়, ভবিষ্যত একজন অন্ধ উদাসীন
শিল্পীর মতন বালিয়াড়ি জুড়ে রবার বাজায়
এবং পায়ের কাছে তার
উটের কংকাল আর সাপের খোলস পড়ে থাকে।
মরুভূমি ক্রমাগত আমাকে করছে গ্রাস পৌরানিক প্রাণীর মতন
আর কী অবাক কাণ্ড ঘুমোতে গেলেই মনে হয়
শুয়ে আছি মরুর বালিতে,
মাথার উপরে কালো বৃশ্চিকের মতো সূর্য জ্বলে
এবং আমার ডান দিকে ফণিমনসার বন,
বাঁদিকে নিয়ত পলায়নপর মরুদ্যান।

মা তার ছেলের প্রতি

এখন আমি বড় ক্লান্ত, আমার দৃষ্টি ক্রমশ
ধূসর হয়ে আসেছ। সন্ধ্যার
সোনালি-কালো প্রহরে ভাবছি, বাচ্চু,
কতদিন তোর সঙ্গে আমার দেখা নেই।
দিনের এই হট্রগোল আর
চেঁচামেচিতে কতজনের গলা শুনি,
কিন্তু তোর কণ্ঠস্বর আমি শুনিনা।
তোর তিন ভাই প্রায় রোজানা আমার কাছে আসে,
আরেকজনের কাছেই থাকি দিনরাত।
শুধু তুই কালেভদ্রে আসিস, মাঝে-মধ্যে
টেলিফোনে শুনি তোর গলা।
আমি জানি তুই তোর নাম মিলিয়ে দিয়েছিস

গাছের পাতায়, ফসলের শীর্ষে,
মেঘনা নদীতে, অলি গলি আর অ্যাভিনিউতে
শহীদের স্মৃতিসৌধে, মৌন মিছিলে।
বাচ্চু তুই সবখানেই আছিস,
শুধু দূরে সরে গিয়েছিস আমার কাছ থেকে।
আমার ইন্দ্রধনু বয়সে তোকে আমি
পেটে ধরেছি দশ মাস দশ দিন, তোর-নাড়ি-ছেঁড়া
চিৎকার এখনো মনে পড়ে আমার।
মনে পড়ে তোর হামাগুড়ির, মুখের প্রথম বুলি।
হাঁটি হাঁটি পা-পা ক'রে তুই
চলে যেতি ঘর থেকে বারান্দায়, তোর মৃদু তাড়ায়
রেলিঙ থেকে উড়ে যেত পাখি,
আমি দেখতাম দুচোখ ভ'রে।
কখনো কখনো ফোরাত নদীর ধারে
তীরে তীরে ঝাঁঝরা-হয়ে যাওয়া কাচবন্দি
দুলদুলের দিকে এক দৃষ্টিতে তুই
তাকিয়ে থাকতিস, যেন ভবিষ্যতের দিকে আটকা পড়েছে।
তোর দুটো চোখ।
জ্বরে তোর শরীর পুড়ে গেলে,তুই আমার
হাত নিয়ে রাখতিস তোর কপালে,
তোর কাছ থেকে আমাকে এক দণ্ডের জন্যেও
কোথাও যেতে দিসনি কখনো।
অথচ আজ তুই নিজেই
আমার নিকট থেকে যোজন যোজন দূরে বিলীয়মান।
বাচ্চু, তোর নাড়ি-নক্ষত্র আমার নখদর্পণে,
কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়,

তোর পরিচয়ের আবছা ঝালর কতটা দুলে ওঠে আমার চোখে?
তোর এখনকার কথা ভাবলে
হজরত ঈশা আর বিবি মরিয়মের কথা মনে পড়ে যায়।
যখন ওরা তাঁকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে
কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল ক্রুশকাঠ,
কালো পেরেকে বিদ্ধ করেছিল সারা শরীর
তখন তাঁর কাছে ছিলেন না মাতা মরিয়ম।
তোর আর আমার মধ্যেও
একাকিত্বের খর নদী, আমি সেই নদী কিছুতেই
পাড়ি দিতে পারি না।
তোর কথা ভেবে ইদানীং আমি বড় ভয় পাই, বাচ্চু।
তাই বারবার ইসমে আজম পড়ে
তোর বালা মুসিবত তাড়িয়ে বেড়াই।
তুই তোর নিজস্ব সাহস, স্বপ্ন আর আকাঙ্খাগুলিকে
আগলিয়ে রাখ, যেমন আমি তোকে রাখতাম
তোর ছেলেবেলায়।

মাস্টারদার হাতঘড়ি

মাস্টারদা, আপনি কি হাতঘড়ি পরতেন কখনো,
এই প্রশ্ন আমাকে ঠোকর মেরেছে
অনেকবার মাস্টারদা, আপনার বিষয়ে
অনেক কিছু জানা আছে আমার।
আপনার শরীরের গড়ন, মূল্যবান রত্নের মতো
চোখের দীপ্তি, জীবন-যাপনে

ধরন-একরম

বহুবিধ খুঁটিনাটির আলো আমি পেয়েছি
গ্রন্থের কালো অক্ষরের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে।
কিন্তু মাস্টারদা, আপনি কখনো
হাতঘড়ি পরতেন কিনা আজ অব্দি আমার জানা হয়নি।
তবে আপনি যে মাঝে-মধ্যে ঘড়ির দিকে
তাকাতেন, তা ধরে নেয়া যেতে পারে।
যিনি নিজে সময়কে শাসন করেন,
সময়ের শাসনও তাকে মেনে নিতে হয়
কখনো সখনো। যখন আপনি পিস্তলের
ট্রিগার টিপেছেন কিংবা মেতেছেন
গোরা সেনাদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে
অথবা পায়চারি করেছেন চট্রগ্রাম জেলের
নীরন্ধ্র সেলের ভেতর,
তখন সময়ের ধ্বনির প্রতি আপনি কি
উদাসীন ছিলেন?
মাস্টারদা, সেই যে মাঝে-মাঝে
আপনার কণ্ঠে উচ্চারিত হতো একগুচ্ছ শব্দ,
সেই অনুসারে আপনি নিজে
চোখেও শুনতেন, কানেও দেখতেন।
ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বীর আশফাকউল্লাহ, অপরূপ
অগ্নিবলয়ের মতো এক মহামাল্যের মণিরত্ন,-
ওদের ঝলকানিতে গান গেয়ে উঠতো
আপনার চেতনা, যখন আপনি বসে থাকতেন
চুপচাপ, নীল নকশা আঁকতেন প্রতিরোধের
কিংবা সহযাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতেন

সামনে পা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে।
মাস্টারদা, যখন আপনার মাথার ওপর
ঝুলছিল ফাঁসির দড়ি, তখন
আপনার ঋজু মেরুদণ্ড কি শিরশিরিয়ে উঠেছিল
শীতার্ত ডালের মতো; আপনার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি থেমে গিয়েছিল
ক্ষণিকের জন্যে? মাস্টারদা, আপনার
ব্যক্তিগত মৃত্যু এক লহমায়
হয়ে উঠেছিল বিপুল জনগোষ্ঠীর যুগপৎ
মৃত্যু এবং জীবন।
মাস্টারদা আপনি কখনো
হাতঘড়ি পরতেন কিনা জানি না; জানবার
প্রয়োজনও নেই তেমন। অমরতা
জ্যোতির্বলয়ের মতো রাখী পরিয়ে দিয়েছে
আপনার কব্জিতে।
আপনার হাত সূর্যোদয়ের প্রসন্নতা নিয়ে
প্রসারিত হয়ে আছে সেই বিশাল ভূখণ্ডের দিকে,
ভাবীকাল যার ডাকনাম।
এবং একটি অলৌকিক হাতঘড়ি, যা আপনি
হয়তো, পরেননি, অথচ আপনারই নামাঙ্কিত
ক্রমাগত বেজে চলেছে
আমাদের হৃৎপিণ্ডে, অনন্তের রৌদ্র-নিঃসীম ঝালরে।

যখন পেছনে ফিরে

যখন পেছনে ফিরে তাকাই সহসা, বিস্ময়ের

রূপালি চমক লাগে চোখে। সুদূর বালক এক,
নিঃসঙ্গ কিশোর, গানে-পাওয়া যুবা একজন,
যখন আমার প্রতি রুমালের ভালোবাসা নাড়ে
এই সান্দ্র গোধূলিতে, চেনা লাগে; আমিও ব্যাকুল
করি প্রিয় সম্ভাষণ। তাহলে কি সত্যি আমি সেই
দূর পাড়াতলীর শ্যামল পথ, আরো পথ ঘাট,
বেগার্ত নদীর বাঁক, বৃক্ষহীন মাঠ, দীর্ঘ সেতু
এবং শহুরে ঝিল পেরিয়ে এসেছি? ছিল যারা
আশেপাশে, একে একে ছিটকে পড়েছে কে কোথায়
আজ শিকারির গুলিবিদ্ধ পাখির ঝাঁকের মতো।
একজন বন্দ ঘরে রাত্রির টেবিল ঘেঁষে একা
পদ্য লেখে এবং হৃদয় তার আর্তনাদ করে
নিঃস্ব নির্বাসিত বাহাদুর শাহ জাফরের মতো।
এখন পেছনে ফিরে ব্যাকুল তাকাতে সাধ হয়
মাঝে মধ্যে, বিগত যা তাকে দামি আংটির মতন
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিই বারংবার আর ছাড়ি
দীর্ঘশ্বাস আমার নিজেরই অগোচরে। ফের কোন্
অজুহাতে পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ভালোবাসা জেগে
উঠবে শ্যাওলা নিয়ে সত্তাময়। অতিক্রান্ত কাল
নিঝুম প্রত্যক্ষ করি যেমন বিদেশ থেকে ফিরে
একান্ত আপন প্রিয় শহরকে দেখি পুনরায়,
দেখি ঘর গেরস্থালি, মানুষের আনাগোনা, স্মিত
বাসর ঘরের আলো, শোকাপ্লুত কালো শবযাত্রা।
আজ থানা পুলিশের মলিন প্যারেড থেকে দূরে
দেবদূতী চুক্তি ক'রে দ্যুতিময় কবিত্বের ঘোরে
সবখানে শব্দ-নখ প্রবল বসিয়ে দিতে চাই।

সকলেই গ্যাছে

সকলেই চলে গ্যাছে, বলা যায় পৌঁছে গেছে ঠিক
নির্দিষ্ট গন্তব্যে, শুধু আমি এই দম আটকানো
রুদ্ধ এলাকায়
দাঁড়ানো ভীষণ একা। কথা ছিল যাবো, নিশ্চয় আমিও
যাবো
সকলের সঙ্গে, কিন্তু আমি বড় বেশি দেরি করে
ফেলেছি নিশ্চিত।
ওরা কেউ পথে কোনো কিছু দেখে, মানে
রূপ-শোভা দেখে দাঁড়ায়নি
একদণ্ড থমকে কোথাও।
ওরা চলে গেছে, লক্ষ্য স্থির রেখে সময় মাফিক।
অথচ স্বভাবদোষে আমি
বস্তুত পথের মোড়ে থামিয়েছি গতি বারে বারে,
কাটিয়ে দিয়েছি বেলা ঘাসফুল আর হরিণের
কী স্নিগ্ধ বিশ্রাম দেখে এবং সত্তায় মেখে সূর্যোদয় আর
নিশ্বাসে গভীর টেনে বৃক্ষঘ্রাণ। কখন যে দলছুট হয়ে
পড়েছি পাইনি টের। এখন আমার
চৌদিকে দেয়াল শুধু নীরন্ধ্র দেয়াল, কোনো দিকে
পথ খোলা নেই এতটুকু। ইতস্তত
ছুটছি ভীষণ এলোমেলো, গলা ছেড়ে
ডাকছি, অথচ
কোথাও কারুর কোনো কণ্ঠস্বর নেই।
যখন মানুষ কোনো স্থির লক্ষ্যে দ্রুত
পৌঁছে যেতে চায়

তখন পথের ধারে দোয়েলের শিস শুনে অথবা দিঘিতে
মাছের রূপালি ঘাই দেখে,
ঝরনা-ধ্বনি শুনে
থমকে দাঁড়ানো, এই মতো কালক্ষয়
সমীচীন নয়। পূর্ণিমার, মল্লিকার প্রেমে পড়া
কস্মিনকালেও নয় লক্ষ্যভেদী পথিকের যোগ্য আচরণ।

সেই গাছ

আমি আমার বাড়িতে প্রত্যহ আসা-যাওয়ার পথে
একটি গাছকে দেখি। অসামান্য কিছুই নয়,
ফুলটুলও তেমন ফোটে না
তার ডালে। সবুজ পাতাগুলি
ঝলমলিয়ে ওঠে রোদে,
পান করে জ্যোৎস্নাধারা।
সবুজ পাতাগুলি কখনো হলদে হয়,
তারপর পাতা
ঝরতে থাকে,
ঝরতে থাকে,
ঝরতে থাকে
গাছটিকে উলঙ্গ ক'রে।
আমি তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমার মধ্যবয়সের
ক্লান্তি মুছে ফেলতে যাই না,
ওকে দেখি দূর থেকে, বাড়ি ফেরার পথে,

বাড়ি থেকে বেরুবার সময়। কখনো কখনো শুনি
কী একটা পাখি
ডাকতে থাকে,
ডাকতে থাকে
ডাকতে থাকে
গাছটিকে সঙ্গীতময় ক'রে।
একদিনের কথা,
কোত্থেকে এক ছন্নছাড়া উদ্ভ্রান্ত ফকির সেই
গাছতলায় আস্তানা গাড়লো
কদিনের জন্যে, তারপর বলা-কওয়া নেই
হঠাৎ নিরুদ্দেশ। মাঝে-মধ্যে
পাড়ার দু-একজন মাস্তান সময়ের তোয়াক্কা না করে আড্ডা দেয় সেখানে,
ওদের মধ্যে কেউ গাঁজেল, কেউ তাড়ি টানে,
কেউ নারীর আঁচল,
কেউবা পাকিয়েছে হাত
ছোরা খেলায়।
ছাপোষা মানুষ আমি, বেসরকারি
স্কুলের শিক্ষকের অক্ষম সন্তান। ইদানীং
বয়সের ভারে ভয়ানক নুয়ে পড়েছেন আমার পিতা,
অবসর তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে, জীবনের
হাতে মার খেতে খেতে তিনি ভীষণ অবনত।
যখন তিনি জায়নামাজ বিছিয়ে
নামাজ পড়েন, তখন তাঁকে শাদাসিধে
আলমগীরের মতো মনে হয় আমার নিজস্ব
স্বপ্নের খোয়ারিতে।
আমি এখনো মাথা নত করিনি।

যা আমার শিক্ষক জনক আমাকে শেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন
সেই উজ্জ্বল সবকটি আমি
শিখে নিয়েছি
শান-বাঁধানো পথের ধারের
সেই গাছ থেকে,
শিখে নিয়েছি তুমুল ঝড়-বাদলেও
কী করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

হাতেম তাই কিংবা শের আফগান

সন্ধ্যে হলেই লোকটা দাতা
হাতেম তাই। তখন তার মুখ থেকে লাগাতার
মণিরত্ন ঝরে, আবার যাতা
শব্দ বেরুতে থাকে, যা নিমেষে নর্দমার
প্রতিযোগী করে তোলে ওর
কণ্ঠনালীকে। লোকটা পকেট উজাড় ক'রে
মধ্যরাতে রিকশায় পায়ের ওপর
পা তুলে ফিরে আসে নিজস্ব গলির মোড়ে।
মেঘের ভেতর দিয়ে সে হেঁটে যায়
একা-একা, ভাড়াটে বাড়িটাকে ওর মনে হয়
বাদশাহী আমলের আলিশান মহল, তার দোরগোড়ায়
রাতের রোগাটে কালোয়
দাঁড়ানো এক সপ্রতিভ উট।
ওর গলার ঘুণ্টি সাপের মাথার মণির মতো
জ্বলজ্বলে আর কার্নিশে এলিয়ে-থাকা অন্ধ জলপরীর মুখে চুরুট

অবিরত

জ্বলে আর নেভে। দরবারী ওস্তাদের গান

অমর্ত্য ফোয়ারা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে

সমস্ত চরাচরে

এবং লোকটা নিজেকে ঠাউরে নেয় শের আফগান।

দিনে যেমন তেমন, সন্ধ্যে হলেই কী এক যাদুকাঠির হেলনে

লোকটা কেমন যেন একটু অন্য রকম

হয়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে

তার রূপ পাল্টাতে থাকে। কখনো সে বাক বাকুম

পায়রা, কখনো বা পাথর। গোলাপী ছিটে-লাগা চোখ দুটো

জড়িয়ে আসে

ঘুমে, আবার কখনো কিসের আভাসে

জ্বলে ওঠে ধ্বক ক'রে। লোকটার বুকের মধ্যে একটা ফুটো

আছে যার উৎস থেকে ক্রমাগত

চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে রক্তের মতো

একটা কিছু। অবশ্য এজন্য সে কোনো

শোক পালন করে না কখনো।

আরো অনেক কিছুর মতোই এটাও দিব্যি তুড়ি মেরে

হেসে উড়িয়ে দেয় সে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথায়

কী গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, কোন চলে কখন কে হেরে

যাচ্ছে, কে-ইবা জিতছে; কার দায়

কে বইছে সিসিফসের বোঝার মতো তা নিয়ে

তিলার্ধ মাথা ব্যথা নেই তার।

অথবা জিহ্বা শানিয়ে

মেতে ওঠা তুমুল তর্কে, ঝাঁপিয়ে পড়া শানদার

ভালুকের লড়াইয়ে তা-ও ধাতে

নেই ওর। অবশ্য বেলা অবেলায়
কী এক জুয়োখেলায়
সেঁটে থাকে অথচ তুরূপের তাস রাখেনা হাতে।
দিনে দিনে রহিম করিম থেকে
আলাদা হয়ে যাচ্ছে, রাম আর শ্যামের ভেতরকার
সাঁকো গুঁড়িয়ে গেছে; একটা কর্কশ অন্ধকার
অনবরত ঢেকে
ফেলছে সবাইকে, রাম-শ্যাম-যদু-মধু রহিম-করিম
প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে কেবলি শত শত
ক্রোশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে নিঃসীম
সমুদ্রের ধমক খাওয়া নৌকার মতো-
এ ভাবনার প্ররোচনা
তার মধ্যে করেনা কোনো বিস্ফোরণের সূচনা।
যেই শহরে সন্ধ্যা আসে ব্যেপে
অমনি লোকটা
চোখটা
এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে ওঠে মোহন ক্ষেপে।
তখন ডাল-ভাত আর মুড়ি শশা আর চা-বিস্কুটের স্বাদ থেকে দূরে
স'রে এসে ডোবে ভিন্ন স্বাদে,
এবং ষড়জে নিখাদে
অস্তিত্ব তার অলৌকিক সুরে
গেয়ে ওঠে গান
আর নিমেষে হয়ে যায় সে হাতেম তাই কিংবা শের আফগান।

The End

PDF by BDebooks.Com